নীরব আর সরব সন্ত্রাসের কবলে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা

শওগাত আলী সাগর

এক.

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের টকটকে ফরসা চেহারাটি একেবারে কালো, তারপর নীল হয়ে যায়। বেদনা আর হতাশা কতোটা চাপ সৃষ্টি করলে একজন মানুষের চেহারায় এই বিবর্তন হতে পারে তা বুঝতে কারোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেশের প্রভাবশালী একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হয়েও তিনি থাকেন নিরিবিলি। সরকারের শীর্ষমহলে এতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনোভাবেই তার প্রকাশ ঘটে না। নিজের দুই ছেলেমেয়েকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। সবসময়ই ইতিবাচক চিন্তা ভাবনার এই মানুষটির মনে দেশটা নিয়েও স্বপ্নের ঘাটতি দেখা যায়নি কখনোই। তবে এই প্রথম হতাশায় ডুবে যাওয়া থেকে অতি কষ্টে নিজেকে খানিকটা ধরে রাখা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, 'এই দেশের আসলে কিছুই হবে না।'

নিরিবিলি থাকা এই লোকটির বাসায়ও একদিন টেলিফোন এলো। 'আমি কালা জাহাঙ্গীর বলছি, আগামী তিন দিনের মধ্যে ২০ লাখ টাকা দেবেন।' হতভম্ব হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ করলেন তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। এরা সবাই দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী শিল্পপতি। সবাই মিলে ছুটে গেলেন বিএনপি মহাসচিব , স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার কাছে। সব শুনে মন্ত্রী ফোন করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে। বাবর আশ্বাস দিলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার। তিনি জানালেন, বাসার আশপাশে সাদাপোশাকে পুলিশের লোক থাকবে। পরামর্শ দিলেন এরপর ফোন এলে নানা উছিলায় কথা বাড়িয়ে সময় নিতে। পুলিশ তার টেলিফোন আড়ি পাতবে। শনাক্ত করার চেষ্টা করবে অপরাধীকে।

এরপর সেই কালা জাহাঙ্গীরের ফোন আর আসেনি। তবে সপ্তাহখানেক পর গুলশানে একটি মার্কেটের সামনে পার্ক করা তার ব্যক্তিগত গাড়িতে মোটর সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দেয় এক তরুণ। তারপর চোখ রাঙ্গিয়ে বলে যায়, ২০ লাখ টাকা চাইলাম তা নিয়ে এতো কিছু? আপনার ছেলেমেয়েরা কখন বাসায় ফিরে তা তো আমাদের জানা আছে।'

এরপর ভদ্রলোক এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি। তবে মানসিকভাবে যে ভেঙে পড়েছেন তা চেহারা দেখেই টের পাওয়া যায়।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ওই চেম্বারের আরেক প্রভাবশালী সদস্য চার্টার্ড একাউন্টেন্টের বাসায় ফোন। আবার সেই কালা জাহাঙ্গীর। আবার সেই টাকার দাবি। এবারও ঘটনাটি জানানো হলো স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে। ভদ্রলোক এখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন।

দুটো ঘটনার কোনোটাই সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। তাই রয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সামাজিক প্রতিপত্তি কিংবা যোগাযোগ সব মিলিয়ে দেশে এদের যেইখানে অবস্থান, তাদের জীবনের এই

ব্যবসায় মার খাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। তবে জেদ করে যারা এই 'পুত্রদের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন, তারা তেমন একটা সুবিধা তো করতে পারেনই না, শুধু নিজেদের হয়রানির পরিমাণটা বাড়ান। বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছিলো জাল টাকা শনাক্তকারী মেশিন, মানি শর্টিং মেশিন কিনবে। যথারীতি টেন্ডার হলো, যাচাই বাছাই হলো। কিন্তু হঠাৎ এক মন্ত্রীপুত্রের শখ হলো ব্যবসাটা তিনি করবেন। নিরুপায় হয়ে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে গেলে খোদ এফবিসিসিআইর অতিচালাক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টুই চেষ্টা করেছিলেন তাদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে। তিনি অবশ্য তা পারেন নি। কিন্তু সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা নতুন করে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। এইবার সন্ত্রাস করেছে সরকার দলীয় একজন সাংসদ এবং পুলিশ মিলিতভাবে

অভিজ্ঞতার বয়ান সাধারণ ব্যবসায়ীদের আরো বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলতে পারে- সম্ভবত এই বিবেচনায় তারা এ নিয়ে মুখ খুলেন নি।

আবদুল আউয়াল মিন্টু
সভাপতি, এফবিসিসিআই

আবদুল আউয়াল মিন্টু ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই'র নেতা এটা যেমন সত্য, তিনি রাজনৈতিভাবে বিএনপি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এফবিসিসিআইতে তার প্রধান অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে বিজনেস ফ্রন্টে সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা- সেটাও বাস্তবতা। এফবিসিসিআইকে পাশ কাটিয়ে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখাবে এটা জনাব মিন্টুর পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন নানা কারণে

দুই.

দেশের ট্রেড পলিটিক্সের অন্যতম নিয়ন্ত্রক, প্রবীণ এক ব্যবসায়ী শিল্পপতিকে ফোন করেছেন এক মন্ত্রীপুত্র। 'আপনার অমুক কাজটা করতে হলে আমাকে এতো লাখ টাকা দিতে হবে।' অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি তা নিশ্চয় তুমি জানো?' মন্ত্রীপুত্রের চটপট জবাব, 'বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বন্ধুত্বের, আর আমার সঙ্গে ব্যবসার। টাকাটা না দিলে কাজটা আপনি করতে পারবেন না।'

ক্ষোভে, লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট করে বসে থাকলেন তিনি। জানালেন ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুকে। কিন্তু সরকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এখন নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন বিএনপি তাহলে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

নিরাপত্তাহীনতা, সন্ত্রাসী তৎপরতা, খুন, রাহাজানি এগুলো এখন আর নতুন কোনো ঘটনা নয় এই দেশে। ছোট থেকে বড়- দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা প্রতিনিয়তই শিকার হচ্ছেন রাজনৈতিক আর সামাজিক দুর্বৃত্তদের। কথা হচ্ছিলো একজন শিল্পপতির সঙ্গে। তার অভিজ্ঞতা, 'আওয়ামী লীগের আমলেও আমরা ব্যবসায়ীদের টাকা পয়সা দিয়েছি। চাঁদা দিতে হয়েছে বাধ্য হয়েই। তখন চাঁদার হারটা নির্ধারণ করতাম আমরাই। এখন চাঁদার পরিমাণ কি হবে তাও ঠিক করে দেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চাঁদাবাজরা। আগে অনেক বড় নেতাও আমরা কি দিলাম তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতেন না। এখন অনেক পাতি নেতাকেও তার চেয়ে অনেক বড় অঙ্কের টাকা দিলেও জিজ্ঞেস করে কতো দিলেন? অঙ্কটা পছন্দ না হলে মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে দেন, ভিক্ষা দিচ্ছেন নাকি?'

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সময়কার চাঁদাবাজির প্রবণতার মূল্যায়ন করে ব্যবসায়ীদের অনেকেই বলেছেন, আগে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতেন, রাজনীতিকরা তাদের প্রয়োজনে চাঁদা নিতেন, মাস্তানদেরও দিতে হতো। এখন চাঁদাবাজরা হিসেব করে- ব্যবসায় কতো লাভ হচ্ছে, তার কতো অংশ তারা পেলো। ভাবটা যেনো তারা ব্যবসার একেকজন অংশীদার। পাওনাটা কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নিচ্ছেন।

কেবল যদি মাসের শেষে থোক একটা পরিমাণ অর্থ চাঁদা দিয়ে পার পাওয়া যেতো তা হলেও না হয় কথা ছিলো। ব্যবসা ক্ষেত্রে এখন নানা ভবন, মন্ত্রীপুত্ররা সম্ভাব্য প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গত কারণেই অনেক ব্যবসায়ী আর সেই প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন না। ফলে ব্যবসায় মার খাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। তবে জেদ করে যারা এই 'পুত্রদের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন, তারা তেমন একটা সুবিধা তো করতে পারেনই না, শুধু নিজেদের হয়রানির পরিমাণটা বাড়ান। বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছিলো জাল টাকা শনাক্তকারী মেশিন, মানি শর্টিং মেশিন কিনবে। যথারীতি টেন্ডার হলো, যাচাই বাছাই হলো। কিন্তু হঠাৎ এক মন্ত্রীপুত্রের শখ হলো ব্যবসাটা তিনি করবেন। ব্যস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মেশিন কেনা প্রকল্পের গতি থেমে গেলো। কেন্দ্রীয় ব্যাংক না পারছে নিয়মানুসারে টেন্ডার বিজয়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দিতে, না পারছে নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে মন্ত্রীপুত্রের পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিতে। মাঝখানে সাধারণ মানুষ ভুগছে জাল ছেঁড়া ময়লা টাকা নিয়ে। সেদিকে আর কে তাকাবে?

কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে দম আটকে মরার মতো অবস্থা হয়েছে পুরনো ঢাকার ছোট ব্যবসায়ীদের। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের আহাজারিতে কেউই সাড়া দেয়নি। সরকার তো নয়ই, তাদের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইও নয়। শেষমেশ নিরুপায় হয়ে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে গেলে খোদ এফবিসিসিআইর অতিচালাক সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টুই চেষ্টা করেছিলেন তাদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে। তিনি অবশ্য তা পারেন নি। কিন্তু সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা নতুন করে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। এইবার সন্ত্রাস করেছে সরকার দলীয় একজন সাংসদ এবং পুলিশ মিলিতভাবে। সন্ত্রাসের প্রতিবাদের তাদের মঞ্চটি পর্যন্ত দখল করে নিয়ে সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু রাজনৈতিক বক্তৃতা করে চোখ রাঙিয়ে গেছেন।

শিউরে ওঠার মতো পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে ব্যবসায়ী নির্যাতনের। খোদ রাজধানীতেই গত একবছরে ৪০ জন ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। ব্যবসায়ীকে হত্যা করে লাশ টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখার ঘটনাও ঘটেছে। পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ব্যবসায়ী চাঁদাবাজদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন, সব ঘটনা তারা থানা পর্যন্ত নিতেও সাহস পাননি। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশাসনের সঙ্গে দেনদরবার করেছেন, সরকারের বিভিন্ন মহলে ঘুরেছেন নিরাপত্তা চেয়ে। কিন্তু সবকিছুই ছিলো নিষ্ফল প্রয়াস। শেষ পর্যন্ত চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের রুখে দাঁড়াতে কোতোয়ালি, লালবাগ ও নবাবগঞ্জ এলাকার প্রায় অর্ধশত ব্যবসায়ী সংগঠন এক হয়ে সম্মিলিত ব্যবসায়ী ঐক্য গঠন করে সন্ত্রাসীদের রুখে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেন।

কোথাও কোনো প্রতিকার না পেয়ে 'ব্যবসায়ীরা আর প্রাণ দেবে না'-এই দাবি তারা পুরনো ঢাকায় ধর্মঘট ডেকে ঢাকা অচল করে দেয়ার মতো চরম কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা আন্দোলনের নতুন

কর্মসূচি নিতে যখন সভা ডাকেন, তাতে উপস্থিত হয়েছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু। তিনি ধর্মঘটের কর্মসূচির বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন। তবে জনাব মিন্টু সভাস্থলেই পোড় খাওয়া ব্যবসায়ীদের তুমুল প্রতিবাদের মধ্যে পড়েন এবং সভা শেষ হওয়ার আগেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু মিন্টু ওই সভায় যে বক্তব্য দেন তাতে তার চাতুর্যের বিষয়টি আর লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। মিন্টুর বক্তব্য, 'ধর্মঘট বা হরতালের মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ সম্ভব নয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আইনের শাসন ছাড়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। ছোটখাটো আন্দোলন করে সন্ত্রাস বন্ধের মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া ব্যবসায়ীদের এই দীর্ঘ দিনের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

জনাব মিন্টু ঘোষণা দেন, শিগগিরই এফবিসিসিআই'র পরিচালনা পরিষদের সভায় সারা দেশের ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বলাই বাহুল্য, দম বন্ধ হয়ে আসা পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীরা জনাব মিন্টুর আশ্বাসে ভরসা রাখতে পারেননি। ফলে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

আবদুল আউয়াল মিন্টু ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই'র নেতা এটা যেমন সত্য, তিনি রাজনৈতিভাবে বিএনপি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এফবিসিসিআইতে তার প্রধান অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে বিজনেস ফ্রন্টে সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা- সেটাও বাস্তবতা। এফবিসিসিআইকে পাশ কাটিয়ে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ দেখাবে এটা জনাব মিন্টুর পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন নানা কারণে। প্রথমত, তিনি সরকারের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তার নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেবে। পুরনো ঢাকার ছোটো পুঁজির ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে জনাব মিন্টুর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে রাজনীতির খোল নলচে পাল্টিয়ে ফেলা। বলাই বাহুল্য, এটি হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রায় অসম্ভব এবং দীর্ঘ কালক্ষেপণকারী প্রক্রিয়া। আবদুল আউয়াল মিন্টুও সম্ভবত ব্যবসায়ীদের প্রাণ রক্ষার আন্দোলনকে কালক্ষেপণকারী প্রক্রিয়ায় ফেলে দিয়ে সরকারের কাছে বাহবা নিতে চেয়েছিলেন। আবদুল আউয়াল মিন্টু এক্ষেত্রে সফল হননি। তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন ব্যবসায়ীদের। সরকারের শীর্ষমহলেও তিনি হয়েছেন তিরস্কৃত।

এফবিসিসিআই অবশ্য পরিচালনা পরিষদের সভা করে দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটি জাতীয় এজেন্ডা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই এজেন্ডা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকেও দেয়া হবে। তাছাড়া আগামী মাসে ঢাকায় সারা দেশের ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি কনভেনশন করার ঘোষণাও দিয়েছে। সেই কনভেনশন কিংবা জাতীয় এজেন্ডা শেষ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে পড়বে তা নিয়ে আগাম মন্তব্য করা কঠিন। তবে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ব্যবসায়ীদের হয়রানি, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য যে আরো বাড়বে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়, ব্যবসায়ীদের বুকফাটা হাহাকার সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারছে না। বরং সরকার যে নিরাপত্তার দাবিটিকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাও প্রকাশ পেয়েছে। তা না হলে সরকারের আচরণ ভিন্ন রকম হতো। ব্যবসায়ীদের নেতা হিসেবে আবদুল আউয়াল মিন্টুও ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের সভায় তাদের কর্মসূচি বিরোধী বক্তব্য দিয়ে রাজনৈতিক সংস্কারের দূরবর্তী স্বপ্নের হাতছানি দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতেন না। বরং তিনি ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মনে সাহস, ভরসা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতেন। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা নিজের মুখে খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের অবস্থা তুলে ধরার একটি সুযোগ পেতেন।

অবশ্য তাতে যে খুব বেশি কোনো ফল পাওয়া যেতো তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ সরকারি দলের একজন সাংসদ যখন গুন্ডা দিয়ে নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনরত ব্যবসায়ীদের মঞ্চ দখল করে নিয়ে ব্যবসায়ীদের চোখ রাঙিয়ে বক্তৃতা করেন, তখন সরকার যে সত্যি সত্যি মানুষের পক্ষে ক্রিয়াশীল তা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর যখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা ব্যবসায়ী নেতাদের সরকারের পক্ষে বক্তব্য দেয়ার জন্য চাপাচাপি করে তখন সরকারের মনোভাব আর অস্পষ্ট থাকে না।

তবে আশঙ্কার ব্যাপার হলো, নিরাপত্তার দাবিতে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের আন্দোলনকে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। সারা বছর চুপচাপ থাকলেও হঠাৎ করে সাবেক সাংসদ হাজী সেলিম দলবল নিয়ে মাঠে নেমে যান ব্যবসায়ীদের বাঁচার আন্দোলনের নেতৃত্ব হাইজ্যাক করতে। আর রাস্তার আন্দোলনে হাজী সেলিম গংদের উপস্থিতিকে নৈরাজ্য সৃষ্টির 'অপপ্রয়াস' হিসেবে রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাতে একটুও দেরি করেন নি সরকার দলীয় সাংসদ নাসির উদ্দিন পিন্টু। তিনি এখন তার সমর্থক ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাঁপ করছেন এটা বোঝাতে যে পুরনো ঢাকায় ব্যবসায়ীদের আসলে কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ নেই। বরং সাবেক একজন সাংসদের নেতৃত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অপতৎপরতা এগুলো। বলাই বাহুল্য, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা বড় ধরনের একটি প্রটেকশন পেয়ে গেলো এতে। তা হলে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দাবিটির কি হবে? না, এর কোনো উত্তর নেই। ব্যবসায়ীদের এখন শুনতে হবে- তাদের আসলেই কোনো সমস্যা নেই। যারা সমস্যার কথা বলবেন তারাও হয়তো বা চিহ্নিত হবেন নৈরাজ্যকারী হিসেবেই।

নিরাপত্তার দাবিতে পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের আন্দোলনকে রাজনীতিকীকরণ করা হয়েছে। সারা বছর চুপচাপ থাকলেও হঠাৎ করে সাবেক সাংসদ হাজী সেলিম দলবল নিয়ে মাঠে নেমে যান ব্যবসায়ীদের বাঁচার আন্দোলনের নেতৃত্ব হাইজ্যাক করতে। আর রাস্তার আন্দোলনে হাজী সেলিম গংদের উপস্থিতিকে নৈরাজ্য সৃষ্টির 'অপপ্রয়াস' হিসেবে রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাতে একটুও দেরি করেন নি সরকার দলীয় সাংসদ নাসির উদ্দিন পিন্টু। তিনি এখন তার সমর্থক ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাঁপ করছেন এটা বোঝাতে যে পুরনো ঢাকায় ব্যবসায়ীদের আসলে কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ নেই